যুদ্ধ চলছে

মখদুম আজম মাশরাফী

বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তি হলো এ বছর। চার দশক পূর্ণ হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। গ্রামে-গঞ্জে,অনেক সন্তান তাদের পিতা মাতাদের নৃশংস হত্যার বিচারের প্রতিক্ষায় আছে। অনেক স্ত্রী আছেন তাঁদের স্বামীদের হত্যার বিচারের প্রতিক্ষায়। অনেক বাবা মা আছেন তাঁদের ছেলে মেয়েদের হত্যা-ধর্ষনের বিচারের প্রতিক্ষায় ।দেশের অসংখ্য বধ্যভূমি থেকে এখনও উঠে আসে লাশের কঙ্কাল। রাজনীতির মাঠে এই বিচার এখন তুরুপের তাস। আদালতে এই বিচার একটি দীর্ঘ কার্য্যকারিতার প্রবাহ। আন্ত´জাতিক স্তরেও এটি একটি দাবার ঘুটি।

অথচ কম্বোডিয়ার সরকার সে দেশের গণহত্যার আর্ন্তজাতিক মানের বিচার করছে ।শাস্তি দিচ্ছে। নূরেনবার্গ, টোকিও, যুগোস্লোভাকিয়া যুদ্ধাপরাধের বিচার করেছে। ইরাকে সাইফ গাদ্দাফীর বিচার সে দেশের সরকার করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা যদি তা করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশও তা করতে পারে। এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বিচারে যা দরকার তা হলো একচ্ছত্র একাগ্রতা।

আসুন, ৪০ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকানো যাক। যদিও আমাদের মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু। কিন্তু পাকিস্তানের কারাগার থেকে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন মুক্তিযুদ্ধের গুনগত মান ক্ষুন্ন করে। কারন যুদ্ধ ব্যপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ন অন্ধকারে। হঠাৎ যুদ্ধজয়ী বিদ্ধস্ত দেশে ফিরে তিনি হতচকিত হন। বেষ্টিত হন নানা স্বার্থগোষ্ঠির কানকথার গুঞ্জনে। এই ঠেলাঠেলিতে নি্ঃস্বার্থরা দুরে পতিত হন। তখন তিনি চাটার দলকে চিনবার মত সম্বিতে নেই। তাজুদ্দিনের নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। অবশেষে "চাটার দল" পরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু ব্যর্থ হন। তার ব্যর্থতা জাতিকে ব্যর্থ করে। ".....ক্ষমা যেথা মূঢ় অপরাধ..." সে অপরাধের শাস্তি তিনি সপরিবারে প্রাপ্ত হন ।শুধু তাই নয়। মুক্তিযুদ্ধের আর চার মহানায়কও দৃশ্যপট থেকে নৃশংসভাবে অপসারিত হন । কাসিম বাজার কুঠির পূনর্মঞ্চায়ন সম্পূর্ন হয়। দেশে আবার "পাকিস্তানী" শাসন ফিরে আসে। তবে এবারে "পাতি-পাকিস্তানী"দের নিয়ন্ত্রনে। পরাজিত পাকিস্তানীদের পেয়াদারা গদিতে আসীন হয়। দলীয় দুঃশাসনে বাকরুদ্ধ, স্তম্ভিত বাঙালী এই "পট বদলকে" দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বস্তিময় দেখতে পান। যদিও গণতন্ত্রের তিরোহন দেশবাসীকে ব্যথিত করে।

মুক্তিযোদ্ধারা মূলতঃ বৃত্তহীন সমাজের সন্তান। ট্রেনিং শিবির থেকে যুদ্ধের ময়দানে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। তাজুদ্দিন আহমেদকে নেতৃত্ব থেকে অপসারনের সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্য্যাদার অপসারন ঘটে। 'বেওয়ারিশ' মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরে দেখে বোন ধর্ষিতা, মা কাতর, আর পিতার ভগ্ন

শরীর। জমি অনাবাদী, ফসলশূন্য। হালের গরু নেই। বিরান। স্বাধীনতার সেই প্রারম্ভ প্রত্যূষে চাকরীতে প্রতিশ্রুত ৩০% অগ্রাধিকারের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে গলা ধাক্কা খেয়েছেন তারা। সাধারন একটুকরো কাগজের মত অসংখ্য সার্টিফিকেট দলীয় লোকদের বিলি করা হয়। অনেক যুদ্ধাপরাধীও আত্মিয়তা সূত্রে্ সার্টিফিকেট হস্তগত করে মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়। যা দিয়ে তারা শুধু আত্মরক্ষাই নয়, বরং বিশেষ সুবিধা বাগিয়ে নেয়। অন্যদিকে, আইন শৃংখলার চরম বিপর্য্যয় ঘটে। সশস্ত্র নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে থাকে। যারা "ষোড়শ বাহিনী" নামে পরিচিত। আজ থেকে ৩৭ বছর আগে, ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আমি্ এ কথাগুলিই লিখেছিলাম। সে সময়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, "আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা?..আপনি কি হাইজ্যাকার?..ডাকাত.?..আত্মপক্ষ সমর্থন করুন..." আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলাম,.."ন্যায় নীতিহীন সমাজে কোন কোন মুক্তিযোদ্ধার ন্যায়নীতি বিচ্যূত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।",..."যে সমাজে মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দেয়াই লজ্জাস্কর সেই সমাজ এই মূহুর্তে বিলুপ্ত হোক আর বিলুপ্ত হোক সেই সমাজের অযোগ্য ধ্বজাধারীরা।" আর তা হয়েও ছিল। নানান সতর্কবার্তা কানে তোলে নি কেউ। তখন বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন। ৭৩-৭৪ এর বাংলাদেশ যারা জানেন সেই অপশাসন, সেই দুঃশাসন তারা ভুলতে পারেন না। ঢাকার পথে পথে সশস্ত্র হাইজ্যাক।সরকার দলীয়দের সশস্ত্র তান্ডব, হামলা, অগ্নিসংযোগ। মহসিন হলে হত্যাকান্ড। সাম্সুন্নাহার হলের সামনে মহিলার সম্পূর্ন কাটা পা। সারা দেশ জুড়ে রক্ষীবাহিনীর বিভিষিকা। গ্রামে গঞ্জে সন্ত্রাস।সেনাবাহিনীতে দ্বন্দ ও অসন্তোস। দেশে অনাহার, দুর্ভিক্ষের পটভুমে গণভবনে রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠান। অবশেষে নিয়ন্ত্রন যখন আর হাতে নেই, শেষ আত্মরক্ষায় বহুদলীয় গণতন্ত্র রহিত করে একদলীয় শ্াসন ব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়। ঐ বিশ্ময়কর সময়ে খুন-সন্ত্রাস-ধর্ষনের বেশ কিছু অপরাধী সরকার দলীয় পক্ষপাত লাভ করতে সক্ষম হয়। যা বিশ্মিত ও ক্রোধান্বিত করে বহুজনকে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতা তাজুদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক হয়েও বঞ্চিত, অবিশ্বস্ত ও অপসারিত হন।

এছাড়াও বিগত ৪০ বছর ধরে রাজনীতির গুণগত মানের নিঃসন্দেহে অবনতি হয়েছে । ৭৫এ সেই যে গণতন্ত্র সম্পূর্ন রহিত হল তার পথ ধরে এলো দু'দুটি সামরিক শাসন। স্বাধীন দেশে রাজনীতিক হত্যা করে ক্ষমতা দখল আর সংবিধান কাটা ছেড়ার ধারা চালু হল। আসলে বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলের বাঙ্গালী রাজনীতিকদের মানের সাথে বর্তমান রাজনীতিকরা এক্কেবারেই বেমানান। এখন সংসদ সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই ব্যবসায়ী ও অরাজনীতিক ব্যক্তি। বেশী সংখ্যক ব্যবসায়ী তাদের সংসদ সদস্য পদ ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেন। আগের মত বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সাংসদদের মত এরা আইনজীবি কিংবা বুদ্ধিজীবি নন। রিপোর্টে প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও এটা সবার জানা যে প্রধান অপ্রধান সব দলের মনোনয়ন এখন বহু অর্থব্যয়ে কেনা বেচা হয়। আর সে প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর কোন সুযোগ নেই। একদলীয় শাসন এখন নেই কিন্তু তার চেয়ে নিকৃষ্ট একব্যক্তিক শাসন্ চলছে

প্রধান প্রধান দলের আর সরকারের কাঠামোতে। এই মনোনয়ন কেনাবেচা যোগ্য প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দিতার সবচেয়ে বড় বাধা।এও এখন চালু হয়েছে যে একই দলের একাধিক 'বিদ্রোহী' প্রার্থী একই আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন্। অনেক আসনে দলীয় প্রার্থীকে বিদ্রোহী কিন্তু জনপ্রিয় প্রার্থী পরাজিত করে আবার দলীয় প্রধানের দোয়া নিতে দেখা করছেন। এ থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দল যোগ্য প্রার্থীকে এড়িয়ে হয়তো বেশী মূল্যে মনোনয়ন বেচছেন আবার মনোনয়নে প্রত্যাখাত হয়েও যোগ্য নির্বাচিত ব্যক্তি নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দলনেতার পদপুট আঁকড়ে থাকছেন্। কারন দলনেতা ছাড়া দলের বা তার নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। এ এক অসহায় অবস্থা

সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে খুব জোরে শোরে রাজনীতি চলছে। ভাতা চালু অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশ মাত্র প্রায় সোয়া লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা দিতে এত দীর্ঘদিন কুন্ঠা বোধ করে থাকলো আমাদের দেশ এ ভেবে লজ্জায় মরে যাই। আগেই উল্লেখ করেছি এই মুক্তিযোদ্ধারা মূলতঃ বিত্তহীন পরিবারের সন্তান। ধরা যাক, ১৬ কোটি জনসংখ্যার যদি মাত্র এক তৃতীয়াংশ লোকও নূন্যতম ১ টাকা করেও গড়ে প্রতিদিন কর দেন, তাহলে প্রতিদিন সরকার কর পান সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী টাকা। যেমন দেয়াশলাই, লবন কিংবা কেরোসিনে একজন অন্ধ ভিক্ষুককেও কর দিতে হয়। এ চিত্র রাজনীকিতদের অকৃতজ্ঞতা আর হীনমন্যতা ছাড়া আর কি হতে পারে। ইতিমধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরন করেছেন। এটা প্রায় মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে প্রহসন হয়ে উঠে যখন অনাহার ক্লিষ্ট, চিকিৎসা নিতে অপারগ অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে দাফনের জন্যে রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদায় 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়ে থাকে। যেন মৃতের সম্মান জীবিতের চেয়ে বেশী। যেন জীবনের মূল্য নেই, মৃত্যুর আছে। আমি ১৯৯৬ সালে জরাজীর্ন সার্টিফিকেট হাতে একজন অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাকে নীলক্ষেত এলাকায় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে দেখেছি। সম্প্রতি খবরে দেখলাম, এমনকি বীরপ্রতীক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরন করতে হয়েছে। একইভাবে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের অনেক আমলাতান্ত্রিক হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে। ক'বছর আগে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়ে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, অফিসের কর্মচারিরা বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মানজনক আচরন করতে।

আমি ৭৪ সালে বিচিত্রায় আরও লিখেছিলাম, প্রায় সোয়া লক্ষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার জায়গায় কয়েক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র দলীয় লোকদের বিতরন করা হয়েছে। সেই জারজ সংখ্যাধিক্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ক্ষুন্ন করা হয়েছে। তা করে তরুনদের দেশের প্রতি নিবেদিত হওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।আর ভূয়া সনদপত্র বিলির মাধ্যমে চৌর্য্যবৃত্তি, দুষ্কর্মকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তারই জের ধরে তালিকাভূক্তির ধারা ৪০ বছর ধরে আজও চলছেই। পৃথীবির আর কোথাও দেশের "শ্রেষ্ট সন্তাদের" নিয়ে রাজনৈতিক ছেলেখেলার এমন উপমা আর নেই।"মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান "এটি যেন আবেগ আপ্লুত একটি ক্যাচওয়ার্ড মাত্র। সব চেয়ে বিশ্ময়ের হলো্ রাজাকার

সমন্বয়ে গঠিত বিগত সরকার ক্ষমতায় এলে সুবিধালাভের জন্যে অমুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভূক্ত করার ধারা বজায় রাখে। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাডারে সরকারী কর্মচারীর মধ্যে অনেকের একাত্তর সালে জন্মই হয় নি-- এ তথ্য পত্রিকার পাতায় প্রমানসহ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সরকারী কর্মচারীদের অনেককে আমি জানি যারা মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও, এই ক্যাডারে বহু পদোন্নতিসহ চাকরী করছে।

বাংলাদেশে সাধারন মানুষ কর্মঠ ও সুখী। খেটে খাওয়া সংসারমুখী মানুষ। সে জন্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা চললেও, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও সবল। কিন্তু দারীদ্র, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা এখনও দেশে মৌল সমস্যা। কিন্তু সম্পদের অসম মালিকানা বাড়ছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তস্কর স্বভাব, রাজনীতিকে ব্যবসায়ীকরন, গণতন্ত্র বলে গলা ফাটালেও শক্তিপ্রয়োগ, সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, হত্যাকান্ড রাজনীতির দৈনন্দিন খবর। যা দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে দেখা যায় না। এক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত শাসন অবধারিত নিয়মে ক্রমশঃ স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। গনতন্ত্রের নামে এক ব্যক্তি, এক পরিবার স্বৈরাচার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে একপর্য্যায়ে জনগণ বিপ্লব ঘটায়। সে বিপ্লব নেতৃত্বহীন ও লক্ষ্যহীন বিদ্রোহ মাত্র হলে তা ডেকে আনে বিশৃংখলা। আবার ক্রুদ্ধ সেনাবাহিনীর কোন অংশও সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। গণতন্ত্র পিছিয়ে যায় অনেক পেছনে। তবে গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার বেশ জটিল বিষয়। ত্যাগী, দক্ষ অনেক সিনিয়র কর্মী সত্য বলার সাহস করলে তার বিনিময়ে হারান অনেক কিছু। ব্যক্তিপূজায় মোহাচ্ছন্ন দুর্ভাগা, অন্নহীন-বস্ত্রহীন-গৃহহীন মানুষেরা আটকে থাকে, প্রতিকৃতি, মাল্যদান, মার্কা আর তোরনের ধাঁ ধাঁয়। আমাদের দেশ ও জাতি সেই মোহ-ধারার দুই পরস্পর বিরোধী স্রোতের ঘূর্নিতে পাক খাচ্ছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ঘটার কারনটি ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য। ৬ দফা ভিত্তিতে "সোনার বাংলা শ্বশান কেন?" পোষ্টারটি ছিল সফল রাজনৈতিক দাবীর প্রতিফলন। অন্যটি ছিল সামরিক শাসন থেকে মুক্তি ও গণতন্ত্রেও দাবী। ৪০ বছর পর আজ যদি ও দুটির একটিও আমরা প্রকৃতভাবে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে থাকি তা হলে আমরা এগুতে পারলাম কোথায়। আমরা একটি সৃজনশীল, শৈলীসম্পন্ন, মেধাবী জাতি হয়েও আমাদের সব শক্তি,চিন্তা ও কর্ম আজকাল অপচিত সেই দ্বিমুখী স্রোতের দ্বন্দ আর সংঘাতে। সম্প্রতি টিপাইমুখ বিষয়ে আসাম ও মনিপুরের মানুষ মুখর। আমরা মুখর ঢাকা ভাগ নিয়ে। দেশের বৃহত্তরও স্বার্থবিষয়েও আমরা দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষনিকের জন্যে হলেও স্থগিত রাখতে্ চাই না।

যে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে তাদের প্রায় সব মূল হোতারাই ৭৩ সালে সাজাপ্রাপ্ত। কিন্তু অনেকে সাধারন ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত অথবা বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পূর্নাবিভুত। যাদের বিরুদ্ধে আসলেই সুস্পষ্ট অভিযোগ ও প্রমান রয়েছে্। গত ৩৭ বছর ধরে এইসব যুদ্ধাপরাধীরা বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আর শহীদদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে মন্ত্রীত্ব করেছে এটা ভাবলে আমাদের নীতি ও কর্মনিষ্ঠা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এদের অনেকেই

এখনও প্রশাসনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদে আসীন থেকে ক্রমাগত জাতির বিরোধিতা করে চলেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে বিরোধীদল যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করছে। যুদ্ধাপরাধীরা আবার গাড়ীতে জাতীয় পত্াকা উড়াবার পায়তারা করছে।

রঙ্গ করে লোকে বলছে, বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে চলেছে তো কি হয়েছে। সারা দেশ ব্যপি আজকাল মাঠে ময়দানে, বক্তৃতা-বিবৃত্তিতে রাজনৈতিক বিতর্ক জারি রয়েছে্। প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দল নেতা উভয়ই আম জনতার উপস্থিতিতে জনসভা গুলিতে পরস্পর কে প্রশ্ন করছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন আবার উত্তরও দিচ্ছেন। এর চেয়ে সাচ্চা গণতন্ত্র আর কি হতে পারে। সুরম্য সংসদ ভবন পড়ে থাক "সুপারসনিক বিল পাশের" জন্যে।"বিতর্কমুক্ত" বিল পাশ সময় বাঁচায় বৈ কি। পৃথিবী বদলে গেলেও আমাদের দেশের জনগণের সময় ও উৎসাহ আছে প্রচুর। অন্য দেশে এতটা নেই।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দ্রুত বিভক্তকরন, সংসদীয়, আইনগত এবং কার্য্যালয় সজ্জার কাজের গতি দেখে এটি প্রমানিত যে, সরকার সত্যি সত্যি ইচ্ছে করলে যে কোন কাজ দ্রুত সম্পাদন করতে সক্ষম। ঢাকাই শুধু বাংলাদেশ নয়। এখন এই উপমা সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে সব রকম সেবা দেশের গ্রামে গঞ্জে পৌছে দেওয়ার দক্ষতা দেখতে আশায় বুক বেঁধে আছে দেশবাসী। দুই বছরের কম সময় দুরের পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হতে তা হবে অনেক সহায়ক।

পরিশেষে, এ কথা যেমন ঠিক যে, গত নির্বাচন ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশবাসীর পূনরায় অঙ্গিকারের আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ,সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায়, ক্ষমতাসীনদের লুটপাটের বিরুদ্ধে রায়। তেমনি এও ঠিক যে এখনও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা সক্রিয়,আর ক্ষমতাসীনদের কেউ কেউ দূর্নীতিগ্রস্থ। তবে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় ফিরে আসতে না পারলে জাতির জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়ংকর ভবিষ্যত।

লেখক একজন মুক্তিযোদ্ধা কবি, লেখক ও চিকিৎসক
mushrafi@hotmail.com